

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

এত

আসফালন
কেন?



সূচিপত্র

রাজনীতি

হতাশা থেকেই আসছে হুঙ্কার

☐ বিপ্লব মিশ্র

রাষ্ট্রবাদ কখনও অসভ্যতার প্রতিশব্দ নয়

☐ হরিশ মুখার্জি

শর্বরীও জানেন, কিছু হবে না

☐ নির্মল দত্ত

আর কবে ঘুম ভাঙবে সুপ্রিম কোর্টের?

☐ স্বরূপ গোস্বামী

আগে নিজেরা পড়ুন

☐ সম্রাট সান্যাল

বিনোদন

নয়ের দশকেই যেন প্রাক্তন হয়ে গেলেন

☐ সম্রাট সান্যাল

ওপেন ফোরাম

সিলেবাস বদলের এত আগ্রহ কেন?

☐ রজত সেনগুপ্ত

খেলা

রূপকথা নয়, মাটির কাছাকাছি

☐ অরূপ মিত্র

একটা মেসিকে পেয়েছি, এও কি কম

পাওয়া!

☐ দিব্যেন্দু দে

কারও ঠোটাই নড়ল না, দেশের সম্মান

বাড়ল?

☐ অজয় নন্দী

ভ্রমণ

রিসর্ট কালচার বন্ধ হোক

☐ উত্তম জানা

মেঘ, পাহাড়, নদী, অরণ্য— কী নেই

উত্তরবঙ্গে?

☐ তিস্তা ঘোষাল

এরপরও বলবেন বাঙালি ঘরকুনো!

☐ দেবায়ন কুণ্ডু

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী



আলোর দিশা কই!

দেখতে দেখতে সরকারের বয়স চার মাস পেরিয়ে গেল। একটা পনেরো বছরের সরকারকে সরিয়ে সবে পথ চলা শুরু। চার মাস সেই তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু চার মাসে অভিমুখটা অন্তত বোঝা যায়।

কোনও সন্দেহ নেই, বেশ সাড়া জাগিয়েই শুরুটা হয়েছিল। জনমানসে একটা প্রত্যাশাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন অতিরিক্ত আগ্রাসী হয়ে উঠল সরকার। বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের ‘অনুগত’ করে তোলা। বিরোধী সাংসদদের এনডিএ শরিক বানিয়ে ফেলা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাণ্ডব চালানো। সারাক্ষণ ধর্মীয় উস্কানি দেওয়া। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হুকুম দেওয়া। এগুলো কোনওটাই কাম্য ছিল না। রাজ্যের প্রায় সব কলেজে কিছুটা নির্লজ্জভাবেই বসিয়ে দেওয়া হল দলীয় পদাধিকারীদের। কোনও সন্দেহ নেই, দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অতীতের সব সরকারকে এই চারমাসেই ছাপিয়ে গেছে নতুন সরকার। বিরোধী শিবির সমালোচনা করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খোদ বিজেপি কর্মীরাও এমনটা চেয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

সরকারের সামনে অনেক কাজ। অনেক জায়গায় অনেক ক্রটি আছে, যেগুলো মেরামত করা জরুরি। নতুন দিশা দেখানো জরুরি। কিন্তু সেদিকে মনযোগ কম। তার বদলে আগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়াল বিরোধী শিবিরকে আক্রমণ। একটু দ্বিমত হলেই ‘দেশদ্রোহী’ বলে দাগিয়ে দেওয়া। যেন দেশপ্রেমের যাবতীয় ঠিকেদারি তাঁরাই নিয়ে রেখেছেন। তাই চার মাস খুব একটা আশার আলো দেখাচ্ছে না।

মূলস্রোত গণমাধ্যম সরকারের লেজুড় হয়ে থাকবে, সেটাই দস্তুর। এমনকী ডিজিটাল দুনিয়াও অনেকটাই সরকারি কন্ড্রায়। সরকারের ভাল কাজের প্রশস্তি হতেই পারে। কিন্তু যেগুলো চরম ঘৃণ্য আচরণ, সেগুলোর পক্ষেও কী অদ্ভুত সব যুক্তি সাজানো হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানিকেও কী অবলীলায় দেশপ্রেম বলে চালানো হচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি ভিন্ন স্বরও থাকুক। ক্ষীণ কণ্ঠ আর সীমিত প্রচার নিয়ে বেঙ্গল টাইমস আগেও সোচ্চার হয়েছে। আগামীদিনেও সেই পথ থেকে সরে আসার কোনও কারণ নেই।



হতাশা থেকেই আসছে ভৃঙ্কার

বিপ্লব মিশ্র

কয়েকদিন আগে বাগেশ্বর বাবা বলে গেলেন, পুজোর সময় আমিষ খাওয়া চলবে না। আমিষ খেলে তিনি পাষাণ।

যিনি করোনার সময় সবাইকে গোমূত্র পান করার নিদান দিয়েছিলেন, এমন অর্বাচীনকে নিয়ে বেশি মাতামাতি না করাই ভাল। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন তাঁর কাছে নতজানু হয়ে যান, মন্ত্রীরা যখন দণ্ড বিগলিত হয়ে প্রজার মতো খেতে বসে যান, তখন সেই মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার লোকদের নিয়ে কিছুটা করুণা হয় বইকি।

বাগেশ্বর বাবা নাকি খাওয়া-না খাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রী নিদান দিলেন, সিপিএমের ষ্টলে কী লেখা থাকবে, কী কী বই থাকবে।

আবোল তাবোল বকার ব্যাপারে তিনি পূর্বসূরিকেও ছাপিয়ে যাচ্ছেন। রোজ নতুন নতুন

বাক্য উপহার দিয়ে চলেছেন। নিজেকে এবং নিজের পদকে ক্রমাগত হাস্যকর করে তুলছেন।

সিপিএম কেন ‘শারদোৎসব’ লিখবে? ভাগ্যিস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে নেই। নইলে তিনি কেন শারদোৎসব লিখলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিতেন। তাঁকেও বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে চলে যাওয়ার নিদান দিতেন।

আসলে, মুখ্যমন্ত্রীর দোষ নেই। এক সময় এই বাংলায় সারদার টাকায় অনেক উৎসব হত। সেখানে কাঁথির কোনও এক রাজপুত্রের নাম মাঝে মাঝেই শোনা যেত। সিবিআইকে দেওয়া সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে সেই যুবরাজের কথা নাম-সহ উল্লেখ আছে। তাই শারদোৎসব শুনলেই হয়তো সারদার কথা কারও কারও মনে পড়ে যেতে পারে। তাঁর মনে হতে পারে, হয়তো তাঁকে আক্রমণ করেই শারদোৎসব লেখা হয়েছে।

শারদ এর সঙ্গে নারদ শব্দটারও বড় মিল। কী জানি, শারদ বললে কেউ হয়তো নারদ শুনবেন। খবরের কাগজ মুড়ে নেওয়া কিছু মহার্য প্রসাদের কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

আসলে, মুখ্যমন্ত্রীর হতাশার জায়গাটা বোঝা যায়। যতই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হোন, বিজেপি কর্মীদের কাছে এখনও তেমন বিজেপি হয়ে

উঠতে পারেননি। দিলীপ ঘোষ থেকে শমীক ভট্টাচার্য, এখনও সুযোগ পেলেই মনে করিয়ে দেন যে তিনি তৃণমূল থেকে এসেছেন। যে দল অনুপ্রবেশ নিয়ে এত সোচ্চার, সেই দলে অনুপ্রবেশকারী হয়ে খুব একটা স্বস্তিতে থাকা কঠিন। তাই তাঁকে আরও বড় বিজেপি হয়ে উঠতে হবে। তাই আরও বেশি করে ‘সাধুসঙ্গ’ করতে হবে। আরও বেশি করে হুঙ্কার ছাড়তে হবে। দলের মধ্যে নইলে যদি নম্বর না বাড়ে!

উঠতি তৃণমূলদের নিয়ে যেমন সমস্যা ছিল, হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসা বিজেপিদের নিয়েও বিড়ম্বনা কম নয়। তাঁদের হুঙ্কার দিতে হয়। ফতোয়া জারি করতে হয়। শারদোৎসব লেখা থাকলে সিপিএমের ষ্টল করতে দেওয়া যাবে না, সরাসরি বিধানসভা থেকে এমন হুঙ্কার দিতে হয়। কোন পুজোয় কার ষ্টল থাকবে, সেটাও মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করে দেবেন? একদিকে দম্ভ, অন্যদিকে সীমাহীন অজ্ঞতা, কোনটার পাল্লা ভারী, বলা মুশকিল।

কেউ কেউ বলছেন, সেই ষ্টল থেকে নারদার ভিডিও চালানো হবে। তার আর দরকার নেই। বরং, কয়েক বছর আগে আরএসএস বা নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে কী কী বলেছিলেন, সেই ভিডিও এখনও দিব্যি পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বরং সেই ভাষণ চালানো যেতে পারে।



‘রাষ্ট্রবাদ’ কখনও অসভ্যতার প্রতিশব্দ নয়

হরিশ মুখার্জি

অদ্ভুত এক উন্মাদের পাঠক্রম। যে কোনও অসভ্যতাই এখন দেশপ্রেমের তকমা পেয়ে যাচ্ছে। কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকেও কী অবলীলায় রাষ্ট্রবাদ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, দিকে দিকে এই প্রবণতাই যেন ছড়িয়ে পড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ নীরব দর্শক। আর মন্ত্রীরা সেই অসভ্যতার নিন্দা করা তো দূরের কথা, উল্টে সাফাই গাইতে শুরু করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামটা শুনলেই এঁদের কেন যে এত গাত্রদাহ হয়, কে জানে! যাদবপুর মানেই নাকি জিহাদি। যাদবপুর মানে দেশ বিরোধী কার্যকলাপ। কী অবলীলায় বলে যাচ্ছেন। পান দোকানের পানুদা, বা চায়ের দোকানের চাঁদুদা বললে তবু না হয় কথা ছিল। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েছেন,

তাঁরাও কী অবলীলায় এইসবপ আবেল তাবোল বকে যাচ্ছেন। তাও আবার গলা ফুলিয়ে, ক্যামেরার সামনে!

অনেক সংযম দেখিয়েও বলতে হচ্ছে, এইসব অর্বাচীন ও মূর্খ লোকেরা মন্ত্রিসভায় কী করছেন? হ্যাঁ, মূর্খদের এবার মূর্খ বলার সময় এসেছে।

গেরুয়া পতাকা নিয়ে বিধায়কের নেতৃত্বে একদল এসে বিশ্ব বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে গেল, ভাঙচুর করে গেল। যেহেতু গেরুয়া পোশাক পরে এসেছে, অতএব এঁদের ‘রাষ্ট্রবাদী’ বলতে হবে! কী অদ্ভুত আবদার! এরপরেও শাসক দলের মধ্যে এই ঘটনার নিন্দা করার লোক তেমন পাওয়া গেল না। উল্টে সেই বিধায়ক এখনও হুঙ্কার দিয়ে বেড়াচ্ছেন। টিভি চ্যানেলে লম্বা ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রীও এসে হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ভুলেই যান যে তিনি প্রশাসনের মাথায় বসে আছেন। তিনি নাকি ড্রোন উড়িয়ে দেখবেন। কোথায় কী হয়, সেইসব ছবি বের করবেন। ড্রোন উড়িয়ে এত কষ্ট করে ছবি তুলে আনার কী দরকার। আপনার দলের বিধায়ক প্রকাশ্যে, ক্যামেরার সামনে তাণ্ডব চালালেন। যদি সৎসাহস থাকে, আগে তাঁকে সবক শেখান। ছাত্রদের পরে হুঙ্কার দেবেন। যদি প্রশাসনিক প্রধান হয়ে থাকেন, তাহলে ওই গেরুয়া

পতাকা নিয়ে যে দুর্বৃত্তরা তাণ্ডব চালিয়ে গেল, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। সেই সাহসটুকু যদি না থাকে, খামোখা ছাত্রদের আর বিরোধীদের হুঙ্কার দিচ্ছেন কেন?

একটি কাগজে ‘গেরুয়া গুডামি’ লিখল বলে নাকি ভাবাবেগে বিরাট আঘাত লেগে গেল। গেরুয়াকে যদি সত্যিই ভালবেসে থাকেন, তাহলে গেরুয়া রঙের সুবাদে যারা অবাধে গুডামি চালিয়ে যাচ্ছে, আগে তাদের থরুন। গেরুয়ার আসল অসম্মান তো তারাই করেছে। বাম জমানায় যখন কোনও অপ্ৰিয় ঘটনা ঘটত, তখন কি ‘লাল সম্ভ্রাস’ বলা হত না? ‘লাল হঠাও’ যখন বলা হয়, তখনও তো কোনও রঙকে, কোনও আবেগকে আঘাত করা হয়। এমনকী যখন তৃণমূলের গুডামি বলা হয়, তখনও সব তৃণমূলকে বলা হয় না।

এই অশিক্ষিত, অর্বাচীনদের কাছে গেরুয়ার কোনও গুরুত্বই নেই। গেরুয়াকে ঘিরে কোনও আবেগও নেই। যদি বিজেপি ক্ষমতায় না আসত, গেরুয়ার ত্রিসীমানাতেও এদের অধিকাংশকে খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই ‘গেরুয়া গুডামি’ কেন লেখা হল, তা নিয়ে হুঙ্কার না দিয়ে, গেরুয়ার সম্মান নিয়ে কারা এই গুডামি করার সাহস পাচ্ছে, আগে তাদের হুঙ্কার দিন। শিক্ষাঙ্গনে এই দুর্বৃত্তদের প্রবেশ বন্ধ করুন। দোহাই, এই অসম্মতাকে, এই গুডামিকে রাষ্ট্রবাদ বলে চালাবেন না।



শর্বরীও জানেন, কিছু হবে না

নির্মল দত্ত

আপনার বাড়িতে একটি টিভি বা কম্পিউটার খারাপ হয়েছে। আপনি মিস্ত্রি ডেকে আনলেন। তিনি সেই কম্পিউটার খোলার আগে থেকেই বলতে শুরু করলেন, আগে যে মেকানিক কাজ করেছে, সে নিশ্চিতভাবে কিছু ভুল করেছিল। তাই আপনার টিভি খারাপ হয়েছে।
আপনি ঘাড় নাড়লেন।

এবার তিনি বললেন টিভিটা খুলতে হবে। কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারছেন না। কারণ, স্ক্রু ড্রাইভার বা অন্যান্য সামগ্রী সঙ্গে আনেননি। তিনি আপনার কাছেই সেই সরঞ্জাম চাইলেন। আপনি কোথেকে পাবেন? তখন আবার সেই আগের মেকানিকের নামে গালমন্দ। সে কেন রেখে যায়নি?

অনেক কষ্টে স্ক্রু ড্রাইভার জোগাড় হল। এবার তিনি টিভি খুলে খুব গম্ভীর মুখে আবার বলতে শুরু করলেন, বুঝলেন, আগের মিস্ত্রি এসব নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু চিন্তা করবেন না। আমি সারিয়ে দেব।

এই এই বদলাতে হবে। এত টাকা লাগবে।

আপনি তাতেও রাজি।

জোড়াতালি দিয়ে যদিওবা ঠিক হল, দুতিন দিন পর আবার খারাপ। এবার আপনি হয়তো আবার খবর দিয়েছেন। তিনি এখনও বলে চলেছেন, আপনার আগের মিস্ত্রি সব খারাপ করে দিয়েছে। আপনাকে বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আপনার স্ত্রীকে শোনালেন। পাড়ায় পাঁচুদার চায়ের দোকানেও শোনালেন। নিজের বাড়িতে গিয়ে নিজের বউকেও শোনালেন।

তিনি যে এত টাকা খরচ করে এত যন্ত্রপাতি আনালেন, তিনি যে সারাতে পারলেন না। সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল, আগের মিস্ত্রি সারতে পারেননি।

আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি রমেশবাবুর বাড়িতে গেলেন। সেখানে গিয়েও বলতে শুরু করলেন আপনার বাড়ির সেই পুরনো মিস্ত্রির কথা। অথচ, রমেশবাবুর টিভিতে তো আগে কেউ হাত দেয়নি। না দিলে কী হবে! আপনার বাড়িতে যে পুরনো মিস্ত্রি দেখে গেছে। তাই রমেশবাবুর টিভিও নাকি খারাপ হয়ে গেছে।

কোনও মিল পাচ্ছেন? আমাদের প্রধানমন্ত্রীই বলুন, আর নতুন মুখ্যমন্ত্রীই বলুন, দুজনেই এক গোত্রের। নিজেদের কোনও দায় বা দায়িত্ব নেই। সব আগের সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দাও। মুখ্যমন্ত্রী না হয় কয়েক মাস হল দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া বারো বছর হয়ে গেল। এখনও তিনি কথায় কথায় নেহরুজিকে টেনে আনছেন। তাঁর

যাবতীয় ব্যর্থতার দায় যেন নেহরুর।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীও সেই পথেই হাঁটছেন। পালা করে আগের সরকারকে গাল পাড়ছেন। দরকার হলে আরও পিছনে চলে যাচ্ছেন। ৩৪ বছর টেনে আনছেন। তাঁর যে কোনও দায় আছে, দেখে মনেই হচ্ছে না। রাজ্যে কোনটা সমস্যা, এখনও ঠিক চেনেন বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ হিন্দু, মুসলমান, গেরুয়া, সনাতনী, সাধুসন্ত— এসব নিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

যাদবপুরে তিনি নাকি ড্রোন ওড়ান। কে কার হাত ধরে হাঁটছে, সেই ভিডিও খুঁজে বের করবেন। অথচ, তাঁর দলের বিধায়ক যে একদল গুন্ডা নিয়ে রাতভর তাগুব চালালেন, আগুন লাগালেন, ভাঙচুর করলেন, সেগুলো তিনি দেখতেও পান না। বিরোধীদের হুঙ্কার দিয়ে কী হবে? সাহস থাকে তো নিজের দলের বিধায়ক ও তাঁর পোষা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। এটার জন্য কোনও ড্রোন ওড়াতে হবে না। সব চ্যানেলেই দেখা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেইসব তাগুবের ছবি দিব্যি ঘুরছে।

আসলে, ওই বিধায়ক বা তাঁর গুন্ডারা জানতেন, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। সেটাই সত্যি হল। যদি যথার্থ মুখ্যমন্ত্রী হতেন, নিজের দলের বিধায়ককে গ্রেপ্তার না করুন, অন্তত শাসন করতে পারতেন। তা যখন পারেননি, তখন না হয় চুপচাপ রইলেন। হুঙ্কার ছেড়ে নিজের কোন অক্ষমতাকে আড়াল করছেন? আপনার হুঙ্কারকে কে পরোয়া করে জানি না, তবে আপনার দলের লোকেরা যে করে না, সেটা পরিষ্কার।

স্বরূপ গোস্বামী

যেমন তেমন জায়গা নয়, একেবারে সার্কিট হাউস। কাছেই ডিএমের বাংলো, এসপির বাংলো। অথচ, রাত দশটা নাগাদ সেখানে প্রবল চিৎকার, কান ফাটানো স্লোগান। দাবি, সার্কিট হাউস থেকে সাংসদকে বের করে দিতে হবে।

সেই উন্মত্ত জনতার ক্ষমতা এতটাই, রাত এগারোটা নাগাদ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি আজগুবি নোটিশ এসে গেল সেই সাংসদের কাছে। বলা হল, সার্কিট হাউসের এই অংশে মেরামতি হবে। তাই খালি করে দিতে হবে। রাত এগারোটায় একজন মহিলা সাংসদকে বলা হচ্ছে, ঘর খালি করে দিতে হবে। তখন নাকি মেরামতি হবে।

এদিকে, বাইরে সেই স্বঘোষিত দেশভক্তের দল ‘জয় শ্রীরাম’ বলে চিৎকার করেই চলেছেন। জিঞ্জেস করুন, রামের মায়ের নাম কী, কজন বলতে পারবেন, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমন ভক্তকুলকে দেখলে রামচন্দ্র নিশ্চিতভাবেই প্রবল আহ্লাদিত হতেন!

রাত পোহালেই পনেরোই আগস্ট। তার আগের রাতে কৃষ্ণনগরের এই ছবিটাই বলে দিচ্ছে, প্রশাসন ঠিক কেমনভাবে চলছে।

মহুয়া মৈত্রের নামে যে যেখানে পারছেন, এফআইআর করে বসছেন। তাঁর কথায় নাকি ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত হয়েছে। কেউ বলছেন,



আর কবে
ঘুম ভাঙবে
সুপ্রিম
কোর্টের?

তাঁর কথায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাও সেই কথাগুলো কখনকার? কোনওটা হয়তো এক বছর আগের, কোনওটা তারও আগের। এত দেশভক্তির ছড়াছড়ি! সত্যিই, মেরা ভারত মহান।



এঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগ, এঁদের দেশপ্রেম এতটাই ঠুনকো, যে যা বলেন, তাতেই নাকি তা ক্ষুন্ন হয়ে যায়। আসলে, দোষটা এই বীরপুঙ্গবদের নয়, তাঁরা যা দেখছেন, তাই শিখছেন।

কয়েকদিন আগেই মহুয়া গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। তাঁর দাবি ছিল, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই তাঁর নামে একের পর এক মামলা হচ্ছে। তিনি গেলে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। অতীতেও এমনটা হয়েছে। প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শক থেকেছে।

বিচারপতিরা কী বললেন? তাঁরা বললেন, ইংরেজ আমলে বিপ্লবীরা বুলেটে সামনে বুক পেতে দিত। আর আপনি একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে ডিমকে ভয় পাচ্ছেন?

শুনতে খুব ভাল। আসলে, এইসব মন্তব্যগুলোই শিরোনাম হয়। সেখান থেকেই দুর্বৃত্তরা উৎসাহ পায়। বিচারপতিদের সম্পর্কে কেউ কেউ যেন অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। ভাবখানা এমন, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। তাঁরা যেন যাবতীয় প্রশ্নের উর্ধ্বে। তাঁরাও কিন্তু মাঝে মাঝেই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন। তাঁরা যদি নিজেদের চেয়ারে বসে ন্যূনতম আইনের রক্ষাটুকু করতেন, একের পর এক মামলা এভাবে প্রহসনে

পরিণত হত না। সিবিআই, ইডি নামক দুটি চূড়ান্ত অপদার্থ এজেন্সি বছরের পর তদন্তের নামে এই ছেলেখেলা করতে পারত না।

যাক, মহুয়ার বিষয়ে ফিরি। রাতের বেলা সার্কিট হাউসের বাইরে যে বীরপুঙ্গবরা বিক্ষোভের নামে অসভ্যতা চালিয়ে গেলেন, তাঁরা জানতেন, যতই পাশে এসপি বা ডিএমের বাংলা হোক, তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না। আসলে, কিছুই বদলায়নি। এসপি বা ডিএম অতি তৎপর হয়ে উঠতেন যদি শাসক দলের কোনও এমপি বা মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ হত। কিন্তু তাঁরাও জানেন, সর্বোচ্চ প্রশাসন তাঁদের নিক্ষিপ্ততাই চাইছে। বরং কীভাবে মহুয়াকে সার্কিট হাউস থেকে বের করতে হবে, কীভাবে আরও হেনস্থা করা যায়, সেই হুকুম তামিল করা বেশি জরুরি। তাই রাত এগারোটায় এমন আজগুবি নোটিস ইস্যু করতেও তাঁদের আটকায় না।

আসলে, তাঁরাও জানেন, সুপ্রিম কোর্ট কিছুই করবে না। তাঁরাও জানেন, মহুয়া যতই লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখুন, কার্যত কোনও পদক্ষেপই হবে না। ওই বীরপুঙ্গবরা যে চিৎকার করে গেলেন, হেনস্থা তাহলে কার হল? মহুয়ার! একেবারেই না।

মহামান্য স্পিকার, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট, আর কবে আপনাদের ঘুম ভাঙবে? এখনও যদি নিজেদের চেয়ারের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন না হোন, আরও অনেক থাপ্পড় আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আগে নিজেরা পড়ুন

সম্রাট সান্যাল

সত্যিই, আজব এক গ্রন্থাগার মন্ত্রী জুটেছেন।

গত পনেরো বছরে যাঁরা যাঁরা এই পদটি অলঙ্কৃত করেছেন, কেউ তেমন উজ্জ্বল ছাপ রেখে যেতে পারেননি। এই দপ্তরটিকে কার্যত কোমায় পাঠিয়ে বসে আছেন।

আর এখন যিনি দায়িত্বে এসেছেন, তিনি যেন পূর্বসূরিদেরও ছাপিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এই দপ্তরটিকে কার্যত ছ্যাবলামির স্তরে নিয়ে যেতে উদ্যত।

তাঁর হুঙ্কার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা কোনও বই লাইব্রেরিতে থাকবে না।

আসলে, এইসব বললে কাগজে খবর হয়,

টিভিতে দেখানো হয়, সহজে নিজের নামটা ছড়ানো যায়। তাই সেই সহজ পথটাই বেছে নিয়েছেন।

লাইব্রেরি দপ্তরের আসল সমস্যা কোনগুলো, সেগুলো বোঝার মতো সময় বা ইচ্ছে, কোনওটাই তাঁর আছে বলে মনে হয় না। কত গুলো লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, কতজন গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য আছে, এগুলো নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথাই নেই। থাকলেও কাগজে প্রকাশিত খবরে তা অন্তত প্রকাশ পায়নি।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কাগজে নাম তুলতে এবার তিনি অন্য একটি বোমা ফাটালেন। আগের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বিধানসভার লাইব্রেরি থেকে ‘সঞ্চয়িতা’ বইটি নিয়ে গেছেন। যেভাবেই হোক, তিনি সেই বই আদায় করে ছাড়বেন। এর জন্য নাকি আইনি ব্যবস্থা নেবেন।

ভাগ্যিস বলেননি আগের মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করবেন।

এইসব হুঙ্কারকে কী বলা যায়? এক কথায় বলতে গেলে, ছ্যাঁচড়াই।

যদি একটি ‘সঞ্চয়িতা’ আগের মুখ্যমন্ত্রী তুলেও থাকেন, সেটা নিয়ে হুঙ্কার দিতে হবে? সেটা যে প্রকাশ্যে এভাবে বলাটা শোভনীয় নয়, সেটা এই অর্বাচীন লোকটিকে কে শেখাবে?

হতেই পারে, মুখ্যমন্ত্রীর কোনও অফিসার বা



কর্মী হয়তো তাঁর অফিসে কোনও কারণে নিয়ে গিয়েছিলেন। দপ্তরে খোঁজ করলে পাওয়া যেতেও পারে। যদি নাই পাওয়া যায়, তাই বলে এভাবে প্রকাশ্যে তাঁর নামে আক্রমণ করতে হবে? একটা শিষ্টাচার, একটা ন্যূনতম ভদ্রতা থাকবে না?

সবিনয়ে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে, বিধানসভার লাইব্রেরি থেকে যদি একান্তই কোনও বই নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্য বিধানসভা কর্তৃপক্ষ আছেন। বিধানসভার লাইব্রেরি কমিটি আছে। স্বয়ং স্পিকার আছেন। এটি যে গ্রন্থাগার মন্ত্রীর এজিয়ারেই নয়, সেটাও কি তাঁর জানা নেই? তাঁকে সেই বই আদায় করার ‘মহান দায়িত্ব’ কে দিল?

এবার তাঁর হৃদয়, সব লাইব্রেরিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বই থাকবে। তাঁকে নিয়ে লেখা বই থাকবে। থাকুক, কে বারণ করেছে?

বিভিন্ন লাইব্রেরি তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী বই কিনবেন। এখন বিজেপির সরকার। স্বাভাবিকভাবেই শ্যামাপ্রসাদের বই থাকবে। এটাও যে উপর থেকে এভাবে চাপিয়ে দিতে নেই। বা সেটা প্রকাশ্যে বলতে নেই, এটাই বা তাঁকে কে বোঝায়!

শ্যামাপ্রসাদের লেখা বা শ্যামাপ্রসাদ সংক্রান্ত বই থাকুক না, আপত্তির কী আছে? তাই বলে, এত ঘটা করে বলতে হবে কেন? তাছাড়া, শ্যামাপ্রসাদের বই লাইব্রেরি থেকেই পড়তে হবে কেন? শ্যামাপ্রসাদকে ভালবাসলে, তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শ্রদ্ধা থাকলে তো এক দুটো বই কিনেও পড়া যায়। মুশকিল হল, শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, এমন লোকের সংখ্যা বিজেপিতেও বড় কম। তাঁরা যে দু-চার কথা বলেন, সেগুলো সব হোয়াটসঅপ ইউনিভার্সিটির ফসল। এটা-ওটা ভিডিও আসে। দু একটা ভুলভাল তথ্যে ভরা লেখার লিঙ্ক আসে। এঁরা সেগুলোই আউড়ে যান। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে খুব সাধারণ দু একটা প্রশ্ন করলে হয় তোতলাতে থাকেন, নইলে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন।

মমতা ব্যানার্জির বই যেমন তৃণমূলের লোকেরা পড়তেন না, এমনকী লাইব্রেরিতে রেখেও লোককে পড়ানো যায়নি। শ্যামাপ্রসাদকেও কি সেই স্তরে নামিয়ে আনতে চান? খুব সহজ কথা, শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে আগে নিজেরা দু একটা বই পড়ুন। তারপর না হয় লাইব্রেরিতে সেই বই রাখার ফরমান জারি করবেন।



রূপকথা নয়, মাটির কাছাকাছি

অরূপ মিত্র

অনেকে বলেন, মেসি নাকি রূপকথার নায়ক। যাঁরা বলেন, হয়তো আবেগ থেকেই বলেন। তাঁদের সেই আবেগকে অসম্মান করার কোনও ইচ্ছেই নেই। সত্যিই তো, মাঠের মধ্যে তিনি যে ম্যাজিক দেখান, তাঁকে রূপকথা বলাই যায়।

কিন্তু আমার কাছে মেসি মানে রক্ত মাংসের এক মানুষ। যিনি ফাইনালে উঠেও হেরে যান। যিনি শিশুর মতো কাঁদেন। যিনি কষ্ট করে কান্না আড়াল করেন। দিনের শেষে ফিরে যান সুখী গৃহকোণে। যেখানে অপেক্ষা করছেন তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান।

তারকাদের জীবনে নাকি নারীদের ছড়াছড়ি। কত কেছা, কত মুখরোচক গল্প শোনা যায়। কিন্তু গত দুই দশকে মেসিকে নিয়ে তেমন কোনও মুচমুচে কাহিনি তৈরি হল না।



ঘুরেফিরে সেই একটিই নাম। এই মেসি কি আমাদের প্রেরণা হতে পারেন না?

আমরা কত অল্পেই হাল ছেড়ে দিই। ধরে নিই, এটা আর হল না। কিন্তু মেসিকে দেখুন। আশি মিনিট পর্যন্ত দু'গোলে পিছিয়ে। তারপরেও কী ঠান্ডা মাথায় পাস বাড়াচ্ছেন। তারপরেও ম্যাচের রঙ বদলে দিচ্ছেন। অর্থাৎ, মাথা ঠান্ডা রাখলে, শান্ত থাকলে, লক্ষ্য স্থির থাকলে, প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকেও ঘুরে দাঁড়ানো

যায়। আমরা নাইবা খেললাম বিশ্বকাপ। আমাদের জীবনে কি এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে পারি না?

এতদিন ধরে মেসিকে দেখে আসছি। কোনও প্রাক্তন খেলোয়াড়কে অসম্মান করতে দেখিনি। বিপক্ষ বা সতীর্থদের সঙ্গেও কত সহজভাবে মেশেন। তিনি যে এত বড় মাপের তারকা, তা বুঝতেও দেন না। অথচ, কত অল্পেই অহঙ্কারে মাটিতে আমাদের পা পড়ে না। অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে

নিজের সম্মান কমে যায় না, এই সহজ কথাটা মেসির মতো এত সহজ করে আর কে বুঝিয়েছেন?

তাই মেসি শুধু ফুটবলার নন, তার থেকেও অনেক বড় কিছু। তাঁর জীবনের টুকটো টুকরো ঘটনাগুলো আমাদের নতুন করে আলো দেখাতে পারে। সেখান থেকে আমরা যদি একটু শিখতে পারতাম!



একটা
মেসিকে
পেয়েছি,
এও কি কম
পাওয়া!

দিব্যেন্দু দে

আমার বেড়ে ওঠা আটের দশকে। স্বাভাবিকভাবেই পেলের খেলা দেখার সুযোগ হয়নি। ছোট থেকেই শুনে আসছি একটাই নাম, মারাদোনা। ছিয়াশির মারাদোনা ঠিক কেমন? সত্যি বলছি, তখনও বাড়িতে টিভি আসেনি। তাছাড়া, তখন শিশু মনে মারাদোনা নামটা সেভাবে দাগও কাটেনি।

মারাদোনা নামটা আরও বেশি করে শুনলাম তার কিছুটা পরে। কিন্তু তখন তো আর ইতালি লিগ দেখার সুযোগ ছিল না। ফলে, মারাদোনাকে ভালভাবে দেখা নব্বইয়ের বিশ্বকাপে। ফাইনালে গিয়েও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি আর্জেন্টিনা। কোথায় লাতিন আমেরিকার একটা দেশ, তার জন্য কেন মন খারাপ হত, জানি না। পরের বিশ্বকাপে যা ঘটল, তার জন্য একেবারেই তৈরি ছিলাম না।



আমার তখন ক্লাস ইলেভেন। মারাদোনা আগের ছন্দে নেই, এবার আর্জেন্টিনা বেশিদূর যেতে পারবে না, এটা মেনে নিতে মনে মনে তৈরিই ছিলাম। তবু লোকটার নাম তো মারাদোনা। যদি কোনও ম্যাজিক দেখিয়ে ফেলেন! কিন্তু সেই মারাদোনাকে কিনা নির্বাসনে পাঠানো হল!

তারপর থেকে বিশ্বকাপ দেখেছি ঠিকই, কিন্তু ভেতর তেকে সেই টান অনুভব করিনি। অন্য কোনও দলকে সমর্থন করিনি। কে জিতল, কে হারল, তেমন কোনও হেলদোল হত না। এমনকী, আর্জেন্টিনাকে ঘিরেও সেই উন্মাদনা আর ছিল না। সেটা ফিরে এল ২০১০ নাগাদ। মারাদোনা কোচ, তাঁর এক নম্বর অস্ত্র লিওনেল মেসি। স্বয়ং মারাদোনা কিনা

বলছেন, মেসি আমার থেকেও বড় প্রতিভা। আবার প্রবলভাবে আর্জেন্টিনার সমর্থক হয়ে পড়লাম। সেবার আর্জেন্টিনা কোয়ার্টার ফাইনানেই ছিটকে গেল। পরের বিশ্বকাপে ফাইনালে। অল্পের জন্য কাপ হাতছাড়া। মনে পড়ছিল নবুইয়ের সেই মারাদোনার কথা। দু'বছর পর সবাইকে অবাক করে মেসি কিনা অবসর নিয়ে বসলেন। খুব আঘাত পেয়েছিলাম। তখন কি সরে দাঁড়ানোর সময়! মেসির নামের পাশে একটা বিশ্বকাপ থাকবে না? আবার ফিরে এলেন। আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু। অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ কাতারে। মরুদেশে যেন মরুদ্যান হয়ে দেখা দিল আর্জেন্টিনা। মেসি ম্যাজিকে ধরা দিল বিশ্বকাপ। আর কী চাই?

এবার মেসির বয়স ৩৯। তবু মন থেকে চেয়েছিলাম, আর্জেন্টিনা জিতুক। রীতিমতো দাপট নিয়ে দলকে ফাইনালেও টেনে তুলল। কিন্তু আবার সেই স্বপ্নভঙ্গ। আসলে, আমাদের সব ইচ্ছে তো সবসময় পূরণ হয় না। নাই বা হল, মেসি যা দিয়ে গেলেন, তার কোনও তুলনা হবে না। পেলেকে দেখিনি, সেরা সময়ের মারাদোনাকেও দেখিনি। মেসিকে তো দেখেছি। আগামী প্রজন্মের কাছে গর্ব করে এটুকু তো বলতে পারব।

নয়ের দশকেই যেন ‘প্রাক্তন’ হয়ে গেলেন

সম্রাট সান্যাল

বাঙালি উত্তম কুমার বলতে অজ্ঞান। মহানায়ক বললে আর দ্বিতীয় কারও নাম মনে পড়ে না। একটি মুখই ভেসে ওঠে। কিন্তু সত্যিই কি আমরা উত্তম কুমারকে ভালবাসি?

প্রশ্নটা শুনলে রেগে যাওয়ারই কথা। বাঙালি উত্তম কুমারকে ভালবাসে না? আচ্ছা, একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো, উত্তম কুমারের কটা ছবি আপনি সিনেমা হলে গিয়ে দেখেছেন? মানে, টিকিট কেটে দেখেছেন?

যাঁরা ছয়ের দশক বা সাতের দশকে বেড়ে উঠেছেন, তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু যাঁদের বয়স পঞ্চাশের নীচে, তাঁরা উত্তম কুমারের যত ছবি দেখেছেন, তা টিভিতেই। তখন জুলাই মাস মানেই চারটি সপ্তাহে উত্তম কুমারের চারটি ছবি। ‘সবেধন নীলমণি’ দূরদর্শনে নানা সময়েই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেইসব ছবি হত। কিন্তু তারপর আর কটা ছবি দেখেছি?

যখনই কেবল টিভি এসে গেল, তখনই উত্তম কুমার যেন ‘প্রাক্তন’ হয়ে গেলেন। এখনও প্রতি বছর জুলাই মাসে নিয়ম করে নন্দনে উত্তম

কুমারের সিনেমা নিয়ে রেন্ট্রোস্পেকটিভ হয়। প্রায় কুড়িখানা ছবি দেখানোর ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আমরা কজন দেখতে যাই? এখন তো ইউটিউবে চাইলেই উত্তম কুমারের বিভিন্ন পুরনো ছবি দেখা যায়। গত এক বছরে আপনি কটা ছবি দেখেছেন? ওই ফেসবুকে কয়েক মিনিটের ক্লিপিংস আসে, ঘুরেফিরে সেগুলো হয়তো দেখেছেন। কিন্তু পুরো ছবি কটা দেখেছেন? একশো জন বাঙালিকে নিয়ে সমীক্ষা চালান। হয়তো দেখবেন, এমন বড়জোর একজনকে পাচ্ছেন যিনি গত এক বছরে উত্তম কুমারের ছবি দেখেছেন।

আসলে, উত্তম কুমার আমাদের একটা নষ্টালজিয়া। আমরা সেটাকে ভাঙিয়ে চলতে চাই। কিন্তু উত্তমের ছবি নিয়ে আমরা যেসব উদাহরণ দিয়ে থাকি, তার সবই তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে দেখা ছবি। হলে গিয়েও দেখি না। এমনকী ফ্রিতে ইউটিউবেও দেখি না।

তাই শতবর্ষের উত্তম নিয়ে আমরা যে যাঁর মতো করে ভাষণ দেব। কেউ কেউ চায়ের দোকানেই গুলতানি মারব। কিন্তু যদি সত্যিই শ্রদ্ধা থাকে, এই বছরটায় সপ্তাহে অন্তত একটা ছবি দেখুন। কোথাও যেতে হবে না, ঘরে বসে ইউটিউবেই দেখুন। সপ্তাহে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় বের করতে পারবেন না? তাহলে আপনি কীসের উত্তম অনুরাগী?

কারও ঠোটই নড়ল না, দেশের সম্মান বাড়ল?

অজয় নন্দী

একদিকে দিল্লি, একদিকে দুবাই। দুই জায়গায় খেলতে নেমেছিল ভারতের দুই দল। দিল্লিতে নেমেছিল ছেলেদের দল। বিপক্ষে আফগানিস্তান। আর দুবাইয়ে ছিল মেয়েদের এশিয়া কাপের ফাইনাল। এখানে প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।

ভারতীয় ক্রিকেট এখন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় বিদেষ মূলক কর্মকাণ্ডকে প্রবল উৎসাহে পালন করা হচ্ছে। আর এই দ্বৈধ প্রেম কেই দেশপ্রেম বলে প্রবল ঢক্কা নিনাদে প্রচার করা হচ্ছে।

খেলা শুরুর আগে জাতীয় সংগীত গাওয়া অনেক দিনের প্রথা। কিন্তু এবার ভারতীয় দল প্রথমে গাইল বন্দেমাতরম, পরে গাইল জনগণমন। অতীতে কোনও দল এইভাবে দুটি গান গেয়েছে কিনা জানা নেই। টাকার দৃষ্টে ভারতীয় বোর্ড সারা বিশ্বেই এক দাদাগিরি দেখিয়ে চলেছে। ফলে ভারতের

নানা অন্যায় আবদারকে মেনে নেওয়া ছাড়া বাকি দেশ গুলির কোনও উপায়ও থাকে না। শুধু বন্দেমাতরম গাইলেই হবে না, পুরো ছটি স্তবক গাইতে হবে। মোদি বাবুদের তেমনই ইচ্ছা। না মেনে উপায় কী? ফল কী হল? প্রথম স্তবক অনেকেই পরিচিত। ফলে অনেকেই গলা মেলালেন। কিন্তু পরের পাঁচটি স্তবক? কোনও ক্রিকেটারের ই ঠোট আর নড়ছে না। মাইকে গান বেজে গেল। সকলে মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শুধু ক্রিকেট মাঠ নয়। যে পার্লামেন্ট কয়েক মাস আগে ফতোয়া জারি করল যে বন্দেমাতরমের পুরো স্তবক গাইতে হবে, সেখানেও যদি এই গান বাজানো হত, একই রকম ফল হত। বক্ষিমচন্দ্রের জন্য এবং বন্দেমাতরম এর ছটি স্তবক গাওয়ানোর জন্য যাঁদের ঘুম হচ্ছিল না, তাঁদেরও ঠোট নড়ত না। তাঁরাও একে এক জন মৌনী বাবা হয়েই দাঁড়িয়ে থাকতেন।

কথায় আছে, আবোধের গো বধেই আনন্দ। সরকারের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড দেখে সেই প্রবাদটাই বারবার মনে পড়ে যায়। বন্দে মাতরম



এর প্রতি এদের কোন ও শ্রদ্ধা নেই। থাকলে ছোট থেকেই এই গানটা শুনতেন এবং মুখস্থ থাকতো। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিও কোন শ্রদ্ধা নেই। থাকলে সাহিত্য সম্মাটের অন্তত একটা লেখা পড়তেন। যেহেতু গানে দুর্গা কথাটা আছে, যেহেতু মন্দির আছে, অতএব এই গানটা মুসলিমদের দিয়ে জোর করে গাওয়াতে হবে। মাদ্রাসায় চালু করতে হবে। তাহলেই দেশে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।

যে গান নিজেরা জানেন না, যে গান বাজলে নিজের মুখ বন্ধ করে মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেই গান গাওয়া বাধ্যতামূলক, এই মর্মে সংসদে আইন পাশ হয়। ফলটা কী হল? বন্দেমাতরম গাওয়া হচ্ছে, কারও ঠোঁট নড়ছে না। এতে দেশের সম্মান বাড়ল? কার মুখ পুড়ল? এবার হয়তো বোর্ড মারফত ফতোয়া

আসবে, ওই গান গাইতে না পারলে ভারতীয় দলেই আর নেওয়া হবে না। খেলোয়াড়রা ব্যাটিং বোলিং প্র্যাকটিস না করে সারাদিন বন্দেমাতরম মুখস্ত করবেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রের ষেড়ে খোকাদের একটাই আর্জি, ক্রিকেটারদের ওপর ফতোয়া জারি করার আগে নিজেরা মুখস্ত করুন। শাসকদের যে সাংসদরা এই গানটা গোটাটা গাইতে পারবেন না, তাঁরা আগে পদত্যাগ করুন। অনেক সংযম, অনেক শিষ্টাচার দেখানো হয়েছে। কথায় কথায় যারা অন্যদের গায়ে দেশদ্রোহী তকমা এঁটে দেয়, এবার সোচ্চার হয়ে তাঁদের মূর্খ বলার সময় এসেছে। গণ্ড মূর্খদের হাতে গণতন্ত্র ও সংসদ সুরক্ষিত নয়। মূর্খদের মুখে দেশপ্রেম শব্দটা মানায় না, এটাও আরও জোর দিয়ে বলার সময় এসেছে।

সিলেবাস

বদলের এত

আগ্রহ কেন?

রজত সেনগুপ্ত

যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, সিলেবাস বদল করতে উঠে পড়ে লাগে। আগের বই থেকে কিছু চ্যাপ্টার, কিছু নাম ছেঁটে ফেলে। নতুন কিছু নাম, নতুন কিছু চ্যাপ্টার ঢুকে পড়ে। তারপর এমন ভান করেন, যেন আর কোনও সমস্যাই রইল না। যেন, শিক্ষায় বিরাট এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। কী কেন্দ্র, কী রাজ্য, কেউই পিছিয়ে নেই। যেন সিলেবাসটা একটু বদলে দিতে পারলেই আর কোথাও কোনও সমস্যা থাকবে না।

আসলে, শিক্ষার আসল সমস্যাগুলো ঠিক কী কী, সেই সম্পর্কে হয় কোনও ধারণা নেই। নইলে, আসল সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এইসব আয়োজন। আচ্ছা, এই মুহূর্তে রাজ্যে কত হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে? এই মুহূর্তে কতগুলি প্রাইমারি স্কুল একজন শিক্ষকের ওপর নির্ভর করে চলছে? কতগুলি স্কুল বাড়ির সংস্কার দরকার? মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কী পরিমাণ শূন্যপদ আছে? যে ছেলেটি মাধ্যমিক

পাস করছে, সে আদৌ মাধ্যমিক পাসের যোগ্য তো? এসব সমস্যা নিয়ে ভাবার সময় নেই। এইসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও তেমন চোখে পড়ে না।

আগের সরকার কী কী অনিয়ম করে গেছে, তা নিয়ে হাওয়া গরম করো। আর সিলেবাস বদল করার কমিটি তৈরি করে দাও। নতুন সরকারও এই শর্টকাট নিয়মেই যেন হাটতে চাইছে। আগের সরকার যদি সিলেবাসে নিজেদের কিছু সাফল্যের ফিরিস্তি ঢুকিয়েও থাকে, শুরুতেই সেগুলো বাদ দিয়ে নতুন করে বই ছাপতে হবে? এক দু বছর যদি তেমন দু-এক পাতা থেকেও যায়, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আসলে, শুধু বাদ দেওয়া নয়, এঁদের নতুন কিছু ঢোকাতেও হবে। এঁরা নিজেদের ঢাক পেঁটাবেন। নিজেরা যেগুলো প্রচার করেন, সেইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবেন। সেই ট্রাডিশনই সমানে চলেছে।

এইসব কাজে প্রচার পাওয়া যায়। আসল সমস্যাকে গুলিয়ে দেওয়া যায়। নিজেদের দায়িত্বকে এড়ানোও যায়। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থেকে যায়। তাই নতুন সরকারের কাছে অনুরোধ, শিক্ষায় যে মৌলিক সমস্যাগুলো রয়েছে, আগে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করুন। প্রতিবছর স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ করুন, ছাত্রদের ড্রপআউট কমান, স্কুলগুলোকে আগের মতো প্রাণবন্ত করে তুলুন। স্কুলে যেন পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসে, স্কুলের কমিটিতে যেন যথার্থ শিক্ষামনস্ক লোকেরাই থাকেন, তা সুনিশ্চিত করা অনেক বেশি জরুরি। আগে এই প্রাথমিক কাজগুলো করুন। সিলেবাস নিয়ে না হয় পরে ভাববেন।



হোম স্টের নামে রিসর্ট কালচার বন্ধ হোক

উত্তম জানা

কয়েকমাস আগে গিয়েছিলাম পাহাড়ে। বছরে দুই থেকে তিনবার উত্তরবঙ্গে যাওয়াটা বহুদিনের অভ্যেস। শহর নয়, পাহাড়ি গ্রামগুলোই আরও বেশি করে টানে। গ্রামের স্নিগ্ধতা, নির্জন প্রকৃতি যেন মন ভাল করে দেয়। ঝাঁ চকচকে হোটেল বা রিসর্ট নয়, পাহাড়ি মানুষদের আতিথেয়তা যেন মন ছুঁয়ে যায়।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে অদ্ভুত একটা প্রবণতা লক্ষ করছি। হোম স্টের নামে গজিয়ে উঠেছে বিশাল ইমারত। সেগুলি হোম স্টে না বলে হোটেল বলাই ভাল। একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, সেইসব হোম স্টের সঙ্গে পাহাড়ি মানুষের তেমন সংযোগ নেই। যাঁরা সেগুলিতে বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা কলকাতা বা আশেপাশের লোক।



হাতে অটেল পয়সা। ব্যাঙ্কে রাখা যাবে না। পাহাড়ের জমি লিজ নিয়ে সেখানে একটা হোটেল বানিয়ে দাও। পর্যটনের সঙ্গে বা পাহাড়ি সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগসূত্রই নেই। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢালাও প্রচার করছেন। অনেকে বুঝে হোক না বুঝে হোক, চলেও যাচ্ছেন। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য কোথাও ডিজে বাজছে। কোথাও সুইমিং পুলের ধারে উদ্দাম নৃত্য চলছে। কোথাও ঢালাও সুরাপানের আয়োজন। এছাড়াও এমন কিছু কর্মকাণ্ড চলছে, যা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকী খাদ্যতালিকায় পাহাড়ি খাবার নয়। বিরিয়ানি, মোগলাই ঢুকে পড়ছে।

মোদা কথা, পাহাড়ের যে পরিবেশ, তা নষ্ট হচ্ছে। এই সব পর্যটকদের আচরণে স্থানীয় মানুষেরা বেশ বিরক্তই হচ্ছেন। স্থানীয় পাহাড়ি মানুষদের সেখানে কেয়ারটেকার বা রাঁধুনি রাখা হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন ট্যুর অপারেটররা লোক পাঠাচ্ছেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে হুগোড় করছেন। কখনও শিলিগুড়িতে নেমে বাসভর্তি পর্যটক ডিজে বাজিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন সেইসব গ্রামে। এমনকী পাহাড়ি খাবারের বদলে বিরিয়ানি, মোগলাই, কাবাব— এসব মেনুতে ঢুকে পড়ছে।

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন গ্রামেই এমন ছবি দেখা যাচ্ছে। এতে সেইসব গ্রামের নির্জনতা, শিথিলতা নষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ের নিজস্বতাই হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ একজন শিক্ষিত ও উদ্যমী মানুষ। পাহাড়ের পর্যটনকে আরও সুন্দর করে তুলতে নিশ্চয় তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। হোম স্টের নামে শহুরে পর্যটন ব্যবসায়ীরা যে বেলল্যাপনার আয়োজন করেছেন, আশা করি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। পাহাড়ি গ্রাম পাহাড়ি মানুষের হাতেই থাকুক। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, প্রয়োজনে সরকারি অনুদান বা ঋণ দিয়ে হোম স্টে কে আরও আকর্ষণীয় করা হোক। কিন্তু শহুরে ট্যুর অপারেটর ও হোটেল মালিকদের প্রবেশ সেখানে বন্ধ হোক।



মেঘ,
পাহাড়,
নদী,
অরণ্য-
কী নেই
উত্তরবঙ্গে?

তিস্তা ঘোষাল

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।

আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা।
আমরা নিজের ঘরকেই ভাল করে
চিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি।
পুজো আসছে। বাঙালি ব্যাগপত্তর
গুছিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কেউ
ভিনদেশে, কেউ ভিনরাজ্যে।
অথচ, নিজের রাজ্যেই কত
ভাল ভাল জায়গা আছে। আমরা
খোঁজই রাখি না।

আমার বাড়ি উত্তরবঙ্গে। সেখানেই
জন্ম, সেখানেই বেড়ে ওঠা। কিন্তু এই
বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরবঙ্গের কতটুকুই বা
জানি! মেয়েদের একটা মস্ত সমস্যা,
ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয় না। নানা

বিধিনিষেধ এসে পড়ে। ভাবতে অবাক লাগে, আমার অনেক বন্ধুই উত্তরবঙ্গে প্রায় ঘোরেনি বললেই চলে। ঘরের কাছেই ডুয়ার্স। আমরা কজন গেছি? গেলেও হয়ত সারাজীবনে একবার বা দুবার। কাছেই পাহাড়। কত সুন্দর সুন্দর গ্রাম। হয়ত দার্জিলিং অনেকেই গেছেন, কিন্তু সেই গ্রামগুলো? অনেকেই যাননি।

সরকার উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার আসছেন। এটা অবশ্যই ভাল একটা উদ্যোগ। নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলিকে জনপ্রিয় করতে আরও প্রচার দরকার। শুধু সরকারের নয়, আমাদেরও কিছুটা দায় আছে। আমরাও আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। সেটা কীভাবে?

আমরা অনেকেই ফেসবুক, হোয়াটস আপ ব্যবহার করি। বাইরে বাইরে বন্ধুরা ছড়িয়ে আছেন। আমরা যদি নিজেদের প্রোফাইলে রোজ উত্তরবঙ্গের একটা করে সুন্দর ছবি পোস্ট করি, তাহলে তা অন্যান্য বন্ধুদেরও নজরে পড়বে। রোজ উত্তরবঙ্গের অজানা সব জায়গা দেখে তারাও আকৃষ্ট হতে পারেন।



যিনি হয়ত দক্ষিণ ভারত যাবেন বলে ভাবছেন, তিনি উত্তরবঙ্গেও আসতে পারেন। এতে এইসব জায়গাগুলো আরও জনপ্রিয় হবে। কারণ, যাঁরা ঘুরে যাবেন, তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের বলবেন। তাঁরাও সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করবেন।

বিষয়টা ভেবে দেখতে পারেন। আমার বন্ধুদের অনুরোধ, আপনারাও নিজেদের ওয়ালে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরুন। অন্য কেউ ভাল ছবি পোট করলে নিজের ওয়ালে তা শেয়ার করুন। এইভাবেই আমরা একটু একটু করে এগিয়ে দিতে পারি আমাদের প্রিয় উত্তরবঙ্গকে।



ট্রেনে ঠাই
নেই,
এরপরও
বলবেন
বাঙালি
ঘরকুনো!

দেবায়ন কুণ্ডু

ভূতের রাজা তিনটি বর দিতে চেয়েছিল।
গুপী-বাঘা কী চেয়েছিল? ১) যেথা খুশি
যাইতে পারি, ২) যা খুশি খাইতে পারি,
৩) মনের সুখে গাইতে পারি। অর্থাৎ,
তারা একটু ঘুরতে চেয়েছে, ভাল-মন্দ
খেতে চেয়েছে, আর গলা ছেড়ে গান
গাইতে চেয়েছে। বাঙালির তিন শাস্বত
চাহিদাই যেন ফুটে উঠেছে।

প্রথমেই তারা চেয়েছে, যেথা খুশি
যাইতে পারি। অর্থাৎ, বাঙালি
ভ্রমণবিলাসী। সে এখানে-সেখানে
বেরিয়ে পড়তে চায়। এটা নিছক
কল্পকাহিনির কথা নয়। পুজোয় ট্রেনের
বুকিংয়ে দিকে তাকালেই ছবিটা
পরিষ্কার হয়ে যাবে। আগে নিয়ম ছিল,



চার মাস আগে থেকে ট্রেনের টিকিট কাটা যেত। এবার কমিয়ে দু’মাস করা হয়েছে। অর্থাৎ, ষাট দিন আগে টিকিট বুক করা যাবে। আমরা কী দেখলাম, পুজোর আগে দূরপাল্লার কোনও ট্রেনেই টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ, বাঙালি সেই সময় বেরিয়ে পড়তে চায়।

দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেনে টিকিট নেই। কাশ্মীর বা রাজস্থান যাবেন, তাও টিকিট নেই। উত্তর ভারত গেলেও ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। এমনকী পড়শি রাজ্য পুরী যাবেন, সেখানে সব টিকিট বুক। আর উত্তরবঙ্গ হলে তো কথাই নেই। হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে রোজ এত এত ট্রেন ছাড়ছে। কোথাও জায়গা নেই। এমনকী ওয়েটিং লিস্টের টিকিটও নেই। মহালয়ার পর থেকেই এই ভিড়। পুজোর সময় এত এত মানুষ ঘুরতে যান? পুজোর আগে যদি বাংলায় আসার ট্রেনে ভিড় হত, তাহলে না হয় বোঝা যেত যে, প্রবাসীরা বাড়ি ফিরতে

চাইছেন। কিন্তু পুজোর সময় কলকাতা থেকে দূরদূরান্তে যাওয়ার ভিড়। অর্থাৎ এই ভিড় ভ্রমণ পিপাসুদের। আর কোনও জাতির মধ্যে বেড়ানোর এমন তাগিদ আছে বলে মনে হয় না।

শুধু যে ট্রেনে এমন ভিড়, তা নয়। নিশ্চিতভাবেই হোটেলের ভাড়াও হবে লাগামছাড়া। ট্রেনে টিকিট না পেয়ে অনেকে বাসের টিকিট কাটতে চাইবেন। সেখানে আবার নির্দিষ্ট ভাড়ার ব্যাপার নেই। ঝোপ বুঝে কোপ মারা। অর্থাৎ, চারগুন/পাঁচগুন ভাড়া দিয়ে টিকিট কাটতে হবে। তাহলে উপায়? কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারেরই কিছুটা ভূমিকা আছে।

১) আরও বেশি করে স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করা ২) বাসের ভাড়া, হোটেল ভাড়ায় নিয়ন্ত্রণ আনা। বাঙালির জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। ঘরকুনো অপবাদ ঘুচিয়ে সে যদি একটু নির্বিঘ্নে ঘুরতে পারে, মন্দ কী?

বঙ্গ টাইমস

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬



bengaltimes.in

**ISSN
2445-5657**